পাতালপুরীর গান

ডঃ ইন্দ্রনীল সেন

[.....উত্তর পূর্ব বঙ্গোপসাগরের বিস্তীর্ণ উপকূলবর্তী সুন্দরবন, নোয়াখালী, বরিশাল, খুলনা ,ভোলা ,সন্দীপ, পটুয়াখালী, কুতুবদিয়া, চট্টগ্রাম ছাড়িয়ে বর্মার টেকনাফ পর্যন্ত শোনা যেত এক বজ্রনির্ঘোষ! লোককথায় যা ছিল রামায়ণের লঙ্কার সিংহদ্বার উন্মুক্ত করবার রুদ্রনাদ কিংবা ইমামের ধর্মযুদ্ধের দামামার হুংকার। আসলে এই দুন্দুভিনাদ প্রকৃতির নাভিমূল-উদ্ভূত জলোদ্মন্দ্র ধ্বনি। অথচ এই শিহরণ জাগানো হুঙ্কারের উৎসস্থলেই লালিত হয়ে চলেছে প্রকৃতির পরবর্তী প্রজন্মের আশ্বাস। শৈশবের শোনা সেই মহানাদের অনুসন্ধানে লেখক। ডঃ ইন্দ্রনীল সেন পেশায় চিকিৎসক হলেও তাঁর নেশায় আছে বিশ্বের বিচিত্র ভূপ্রকৃতি, আর আছে হিমালয়-প্রেম।]

বরিশাল গান। কথাটা আমি প্রথম শুনেছিলাম বাবার মুখে। তখন ইশকুলে পড়ি। '৭৮-এর বন্যা চলছে বাংলা জুড়ে। বানভাসি বাংলার সঙ্গে কলকাতাযও ডুবু ডুবু। দিনের পর দিন একনাগাড়ে অঝোর বৃষ্টি। ইশকুলে ছুটি। পড়ে পাওয়া বোনাস এর মতো গরমের পরে বর্ষার ছুটি! সন্ধ্যে হলে রোজ লোডশেডিং। হ্যারিকেনের আলোয় কোনরকমে নমো-নমো করে পড়াশোনার পাঠ চুকিয়ে দিতাম। চারপাশে অবিরাম বৃষ্টি আর জল পড়ার শব্দ।

বাবা যখন ফিরতেন অফিস থেকে, ছাতা জুতো ভিজে একসা। কাদার ছিটে লাগা জামাকাপড় পালটে স্নান করে বসতেন টেবিলে। মা আনতেন আদা-দেওয়া চা। বাবা খুব চা খেতেন। রান্নাঘর থেকে টেবিলে দিতে দিতেই মুখ দিয়ে বলতেন, 'ঠান্ডা হয়ে গেল'। মা রেগে বলতেন, 'তবে তুমি কেটলি থেকেই খাও। এর থেকে গরম চা হবে না।' আমি আর বোন দু চামচ করে বাবার চায়ের দাগ পেতাম, অবশ্য ঠান্ডা হলে তবেই।

এরকমই এক বর্ষার সন্ধ্যেয় বাবা বলেছিলেন গল্প - বরিশালের গান। প্রথমে ভেবেছিলাম বরিশাল জেলার গান-টান হবে বোধহয়। বাবার জন্ম কলকাতায় হলেও ঠাকুরদার কর্মসূত্রে ইশকুল, শৈশব ,পড়াশোনা সবই হয়েছে চট্টগ্রামে। ঠাকুরদা ছিলেন স্বনামধন্য চিকিৎসক এবং ব্রিটিশ আমলের রাজকীয় আই-এম-এস সার্ভিসের হেলথ অফিসার। বিশাল বাংলো, আর্দালি, খানসামা, কোচোয়ান, সহিস – তার বোলবোলাই আলাদা। মাঝে মাঝে আরও সব উচ্চপদস্থ ভারতীয় অফিসারদের পরিবারের সঙ্গে সবাই মিলে বেড়াতে যেতেন কক্সবাজারের সমুদ্রতটে। এই উপমহাদেশের অন্যতম সুন্দর সাগরবেলা কক্সবাজার। বস্তুতপক্ষে পরবর্তী জীবনে বহুবার আমাদের নিয়ে আমার ভ্রমনপ্রিয় বাবা ভারতের একাধিক সমুদ্রসৈকতে বেড়াতে গেলেও কক্সবাজারকে কখনোই ভুলতে পারতেন না। পুরী, গোপালপুর ,ওয়ালটেয়র, মেরিন বিচ, কন্যাকুমারী এমনকি কোভালম-ও বাবাকে ভোলাতে পারেনি।

কক্সবাজারের তুলনায় বাবার কাছে সবই ছিল পানসে।

এই কক্সবাজারের-ই এক প্রবল বর্ষার রাতে বাবা জীবনে প্রথম এবং শেষ বারের মত শোনেন সেই অতিপ্রাকৃত গর্জন, 'বরিশাল গান'। গভীর সমুদ্রের দিক থেকে ভেসে আসা এক প্রবল শক্তিশালী গম্ভীর নাদ। কামানের গোলা দাগার শব্দের সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য থাকায় একে 'বরিশালের কামান গর্জন' বলেও অভিহিত করা হতো। উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের বিস্তীর্ণ উপকূলবর্তী সুন্দরবন, খুলনা, বরিশাল, ভোলা ,সন্দীপ, কুতুবদিয়া, চট্টগ্রাম ছাড়িয়ে সুদূর বার্মার সীমান্তবর্তী টেকনাফ পর্যন্ত শোনা যেত সেই অতি গম্ভীর মহানাদ। মধ্যরাতের নিস্তব্ধ প্রহরের সেই গর্জনে শিউরে উঠতেন সবাই, শিশুদের কানে হাত চাপা দিতেন সভয়ে।

তাদের আশঙ্কা ছিল, এই 'গায়েবী আওয়াজ' বা অলৌকিক শব্দ শুনলে শিশুদের অমঙ্গল হয়। অনিবার্যভাবে একে ঘিরে ছিল কিছু ধর্মীয় কিংবদন্তী।

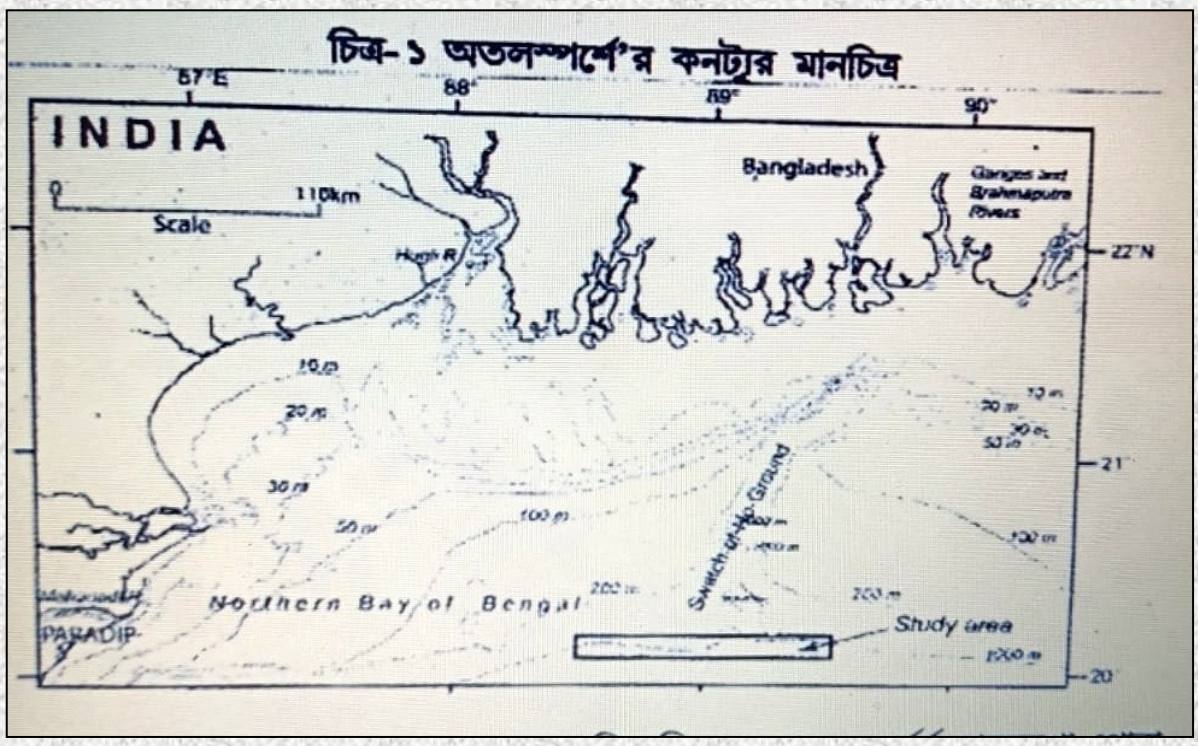

চিত্র-১ অতলস্পর্শে'র কনট্যুর মানচিত্র

হিন্দুরা বলতেন, এ নাকি সমুদ্র পেরিয়ে ভেসে আসা রাবণের স্বর্ণলঙ্কার সিংহ দরজা খোলার আওয়াজ। মুসলমানরা বলতেন, বরিশাল-গান তাদের ইমামদের ধর্মযুদ্ধের দামামা নির্ঘোষ। যাই বলা হোক না কেন প্রকৃত পক্ষে শব্দের উৎস ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সমুদ্রের যে গভীর প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এই গর্জন ভেসে আসত সেখানে কোনও জনমানবের অস্তিত্ব অকল্পনীয়! সুতরাং এটি মনুষ্যসৃষ্ট নয়। বজ্রপাত কিংবা সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গেও এর মিল নেই। দক্ষিণবঙ্গের উপকূলে বাস করা মানুষ ও-দুটোর সঙ্গে আজন্ম পরিচিত। কোনও গ্রহণযোগ্য বা সন্তোষজনক উত্তর না থাকায় 'বরিশাল গান'-কে ঘিরে গড়ে উঠেছিল এক আদিভৌতিক রহস্যের বাতাবরণ। বর্ষার রাতে বাবার গল্পের বর্ণনায় সেই অতিপ্রাকৃত রহস্যের ছোঁয়া এসে লাগত আমাদের মনেও। গা ছমছম করত গল্প শুনে।

কিন্তু রহস্যটা ছিল সত্যি। উনিশ শতকেই কয়েকজন অসমসাহসী ব্রিটিশ নাবিক আর সমুদ্র-বিশেষজ্ঞরা এই ধাঁধার জট ছাড়াতে নেমে পড়েছিল। উত্তর বঙ্গোপসাগরে জনমানবশূন্য নির্জন দ্বীপে রাতের পর রাত জেগে, বিপদ আপদ তুচ্ছ করে তারা গবেষণা চালিয়ে গিয়েছিলেন। নিঃসংশয় সমাধান না হলেও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছিল তাদের গবেষণায়।

বর্তমান ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কিছুটা পূর্বদিকে উপকূল থেকে মাত্র ত্রিশ কিলোমিটার এর মতন সমুদ্রের গভীরে গেলেই এমন একটা অঞ্চলে পৌঁছে যাওয়া যায় যার 'তল মেলে না'! সুন্দরবনের মাঝিমাল্লা, লঞ্চ ট্রলারের সারেঙরা তথ্যটি জানিয়েছে। তারা ওই অঞ্চলে যেতে ভয় পায়। তাদের কথায় 'জায়গাটা বড় অদ্ভুত!' মাত্র কয়েক'শ মিটার এপাশে-ওপাশে নৌকা বা ট্রলার নোঙর ফেললে তা অনায়াসে নিজের জমিতে আটকে যায়। গভীরতা বড়জোর পঞ্চাশ কি ষাট ফুট। কিন্তু মালঞ্চ মোহনা আর রায়মঙ্গল থেকে দক্ষিনে ২১--২২ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে সমুদ্রের গভীরতা একেবারে 'অতল'! ২--৩ হাজার ফিট দড়ি নামিয়েও তল

পাওয়া যায় না। ভাবা যায়? মাঝি-মাল্লাদের এই কাহিনীর সত্যতা মেনে নিয়েছিল সেকালের দুর্ধর্ষ লালমুখো ঘোড়ার সাহেব নাবিকরা। তারা জায়গাটার নাম দিয়েছিল 'অতলস্পর্শ গহ্বর'(SWATCH OF NO GROUND) যেখানে তল মেলে না !

বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ ওল্ডহ্যাম (R.D.OLDHAM) ১৮৯৩ সালে তাঁর MANUAL OF GEOLOGY-তে বলেছিলেন '...in the sea outside the middle of the delta, there is a singularly deep area known and marked on the charts as the "Swatch of no ground," in which soundings which are from 5-10 fathoms all around, change almost suddenly to 200 to 300 fathoms...' ইতিপূর্বে ১৮৬৩ সালে ভূতত্ত্ববিদ ফার্গুসন Quarterly Journal of the Geographical Society-তে প্রকাশিত প্রবন্ধে মতামত দেন যে বঙ্গোপসাগরের তটরেখা আকারের কারণে পূর্ব পশ্চিম দিক থেকে আসা বিপরীতমুখী স্রোতের কারণে এই স্থানে আবর্ত বা ঘূর্ণির সৃষ্টি করেছে। ওখানে কোনও মাটি পড়ে জমতে পারে না। ঘুর্ণিতে ছিটকে পদ্মা-মেঘনার লক্ষ লক্ষ টন পলিমাটি কখনো উপকূলবর্তী অঞ্চলে চর সৃষ্টি করে, কখনো গভীর সমুদ্রে দ্বীপের জন্ম দেয়। বঙ্গোপসাগরে এসে মেশা সবকটি নদীর গতি ওই অতলস্পর্শের দিকে ধেয়ে যায়। এইজন্য সুন্দরবনের দক্ষিণে যত চর পড়ে তাদের সবারই অগ্রভাগ ওই অতলস্পর্শী খাদের দিকে ফিরে থাকে। পূবদিকের চরের মুখ পশ্চিমে, আর পশ্চিম দিকের চর পূবমুখি হয়ে থাকে।

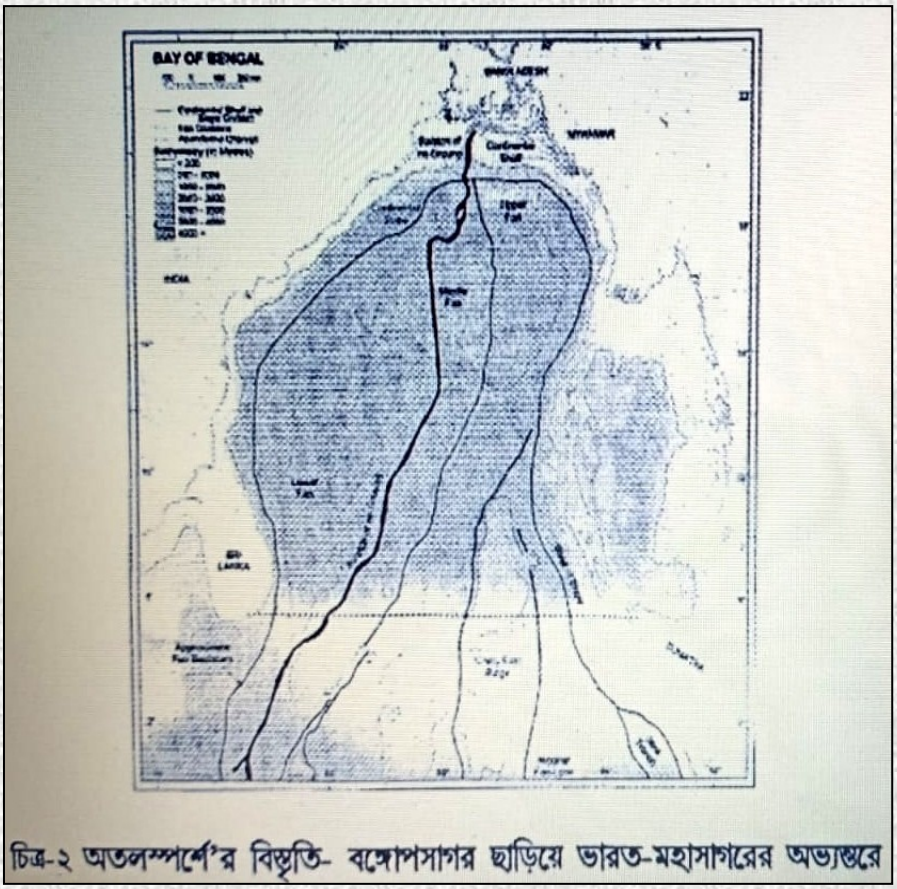

চিত্র-২ অতলস্পর্শে'র বিস্তৃতি- বঙ্গোপসাগর ছাড়িয়ে ভারত-মহাসাগরের অভ্যন্তরে

অমন অতিকায় ঘূর্ণির টানে সুন্দরবনের মাটি আলগা হতে হতে জলের টানে লাগাতার ওই অতলস্পর্শী গহ্বরে গিয়ে পড়তে থাকে। একটানা দীর্ঘদিন এভাবে চললে গলা কেটে আলগা হয়ে যাওয়া জমি, বিস্তীর্ণ অঞ্চল-জুড়ে হুড়মুড়িয়ে ধসে পড়ে। চারপাশ থেকে মুহূর্তে ধেয়ে আসে জলপ্লাবন। হতে পারে সেই প্রলয়কাণ্ডই 'বরিশাল গান'-এর উৎস। আবার বহুদিন ধরে নতুন পলিমাটি পড়ে পড়ে জমি উঁচু হয়ে ডাঙ্গা দেখা দেয়।। যুগ যুগ ধরে এরকমই উত্থান-পতন ঘটে চলেছে আমাদের সুন্দরবনে।

ফার্গুসন সাহেবের উক্ত তত্ত্ব খুব যুক্তিগ্রাহ্য মনে হলেও এর সপক্ষে কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ সেকালে হাতে পাওয়া সম্ভব ছিল না। তাছাড়া ওই তত্ত্বে ঘূর্ণির কারণে ভূমিধস মেনে নেওয়া গেলেও বারে বারে তা

কেন একই জায়গায় ঘটবে, তার কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না। আর এই বিপুল পরিমান ভূমিধস ঘটতে গেলে যে পরিমাণ ভূমিখন্ডের প্রয়োজন, তা দু-তিন বছর গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। কিন্তু 'বরিশাল গান' তো মাঝে মাঝেই বর্ষাকালের শোনা যায়! সুতরাং দুইয়ে দুইয়ে চার তো করা যাচ্ছে না।

এই প্রসঙ্গে অন্যান্য গবেষকদের অভিমত কী? দেখা যাক। বরিশালের সার্ভেয়ার মিস্টার পোলোর মত এরকম - 'বরিশাল গান' বর্ষার বিপুলাকার সমুদ্রতরঙ্গের পারস্পরিক সংঘাতের শব্দ। কিন্তু সে ক্ষেত্রে সমুদ্রের বিভিন্ন স্থানেই বা তা ঘটবে কেন? আবার ভূতত্ত্ববিদ মিস্টার বিভারিজ-এর মতে বর্ষার বিপুল জলপ্রবাহ ওই অতলস্পর্শী গহ্বরে পড়ার সময়ই ওরকম ভীষণ শব্দ হয়। অর্থাৎ 'সাগরতলে জলপ্রপাত'! সেও কি সম্ভব? বিভারিজ এই শব্দের উৎস সন্ধানে বরিশালের দক্ষিনে কুকরি-মুকরি দ্বীপে বসবাসকারী আরাকানি জনগোষ্ঠীর লোকেদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। তাতে বিশেষ সুবিধা হয়নি। তাছাড়া অতলস্পর্শ রয়েছে খুলনা ও ২৪ পরগনার দক্ষিনে; আর শব্দের উৎস আরও পূর্ব-দক্ষিণ ঘেঁসে বরিশালের দক্ষিণে অর্থাৎ, সেখানেও গরমিল। বিখ্যাত ডিরোজিয়ান বাবু গৌরদাস বসাক এই শব্দের উৎস সন্ধানে মোরেলগঞ্জের দক্ষিণে 'টাইগার পয়েন্ট' পর্যন্ত গিয়েছিলেন, কিন্তু 'বরিশাল গানের' নিশ্চিত সমাধান খুঁজে পাননি। তিনি এবং রেনি সাহেব অনুমান করেন যে আরাকান উপকূলে সমুদ্রগর্ভস্থ কোনও আগ্নেয়-উদগীরণ সম্ভবত এই শব্দের উৎস। অনুমানটি নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ। কিন্তু আমরা জানি, ভারতীয় উপমহাদেশে প্রশান্ত মহাসাগরীয় আগ্নেয় মেখলা'র (Pacific volcanic belt বা ring of fire) একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী দ্বীপ আন্দামানের 'ব্যারেন আইল্যান্ড'। সেটি ভূগোলের হিসেবে যা 'বরিশাল গান', তা থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে। সুতরাং অংক মিলছে না। বিভারিজ সাহেব আবার অন্যত্র বায়ুমণ্ডলে বৈদ্যুতিক বিপর্যয়-কে ওই আশ্চর্য গানের কারণ হিসেবে কল্পনা করেছেন। সেকালে হয়তো এরকম ভাবা অস্বাভাবিক ছিল না, কিন্তু হালের এই 'স্যাটেলাইট জমানায়' সমুদ্রের উপর বজ্রগর্ভ মেঘ সঞ্চার হলে তা বিজ্ঞানীদের নখদর্পণে থাকার কথা!

সাম্প্রতিককালে আবহবিজ্ঞানীরা বায়ুমণ্ডলের অতি উচ্চ অংশে তাপমাত্রা ও বৈদ্যুতিক আধানের তারতম্যের কারণে দূর থেকে আগত শব্দ তরঙ্গের চলাচলের কিছু অস্বাভাবিকত্ব নজর করেছেন যার সঙ্গে 'বরিশাল গানের' কার্যকারণ সম্পর্ক থাকতে পারে বলে অনেকে মনে করছেন। তৎসত্ত্বেও সেটা বারে বারে খোলা সমুদ্রের একটা বিশেষ জায়গাতেই কেন হবে তার কোনও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা আজও বিজ্ঞানের কাছে নেই।

সুতরাং সবকিছু কেটেছেঁটে আমাদের ফিরে আসতেই হচ্ছে ফার্গুসনের অতলস্পর্শ তত্ত্বের এলাকায়। আধুনিক ভূতাত্ত্বিক গবেষণাতেও ইঙ্গিত মিলেছে যে ফার্গুসনের অনুমান পুরোপুরি না হলেও অংশত সঠিক। সাম্প্রতিক মহাসাগর বিজ্ঞানের গবেষণায় প্রমাণিত যে উত্তর বঙ্গোপসাগরের মহীসোপানের ঠিক মাঝামাঝি প্রায় ৯০ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমা বরাবর একটি অতিকায় ফাটল বা গিরিখাত রয়েছে সমুদ্রগর্ভে (চিত্র ১)। এই গভীর খাতটি ২১-২২ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশের শুরু হয় ক্রমশ দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হয়ে আড়াই হাজার কিলোমিটার নেমে এগিয়ে গেছে শ্রীলঙ্কা ছাড়িয়ে ভারত মহাসাগর অভিমুখে (চিত্র ২)। এই ফাটলের আশেপাশে যেখানে সমুদ্রের গভীরতা বড়জোর ২০-৩০ মিটার সেখানে হঠাৎ করে গিরিখাত এর মতো সমুদ্রতল নেমে গেছে হাজার মিটার এর নিচে।

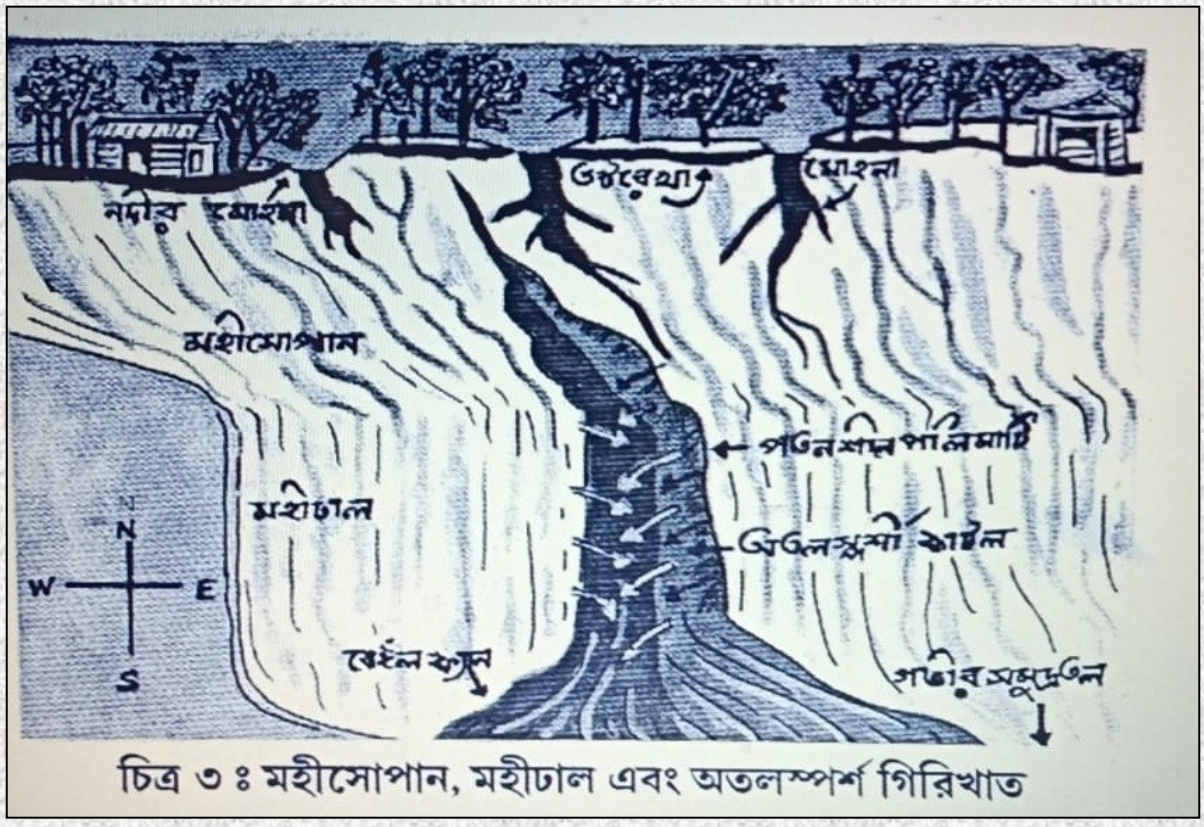

চিত্র ৩ঃ মহীসোপান, মহীঢাল এবং অতলস্পর্শ গিরিখাত

গিরিখাত এর পাদদেশে একেবারে নেমে গেছে বঙ্গোপসাগরের মূল গভীর সমুদ্রতলে। সেখানে এই বিশাল ফাটল দিয়ে নেমে আসা গঙ্গা-পদ্মা-মেঘনার লক্ষ লক্ষ টন পলিমাটি সমুদ্রতলে ছত্রাকের আকারে ছড়িয়ে পড়ে সৃষ্টি করেছে প্রসিদ্ধ 'বেঙ্গল ফ্যান' যার দৈর্ঘ্য তিন-হাজার কিলোমিটার, প্রস্থ এক-হাজার কিলোমিটার এবং এই স্তরটি ১৬-১৭ কিলোমিটার (?) পুরু। ভূতাত্ত্বিকদের মতে সারা পৃথিবীতে এই বিশাল মাপের সমুদ্র গর্ভস্থ পলিমাটির অধঃক্ষেপে বেনজির। সমুদ্রগর্ভস্থ গিরিখাতের দু'পাশের দেওয়াল খুবই খাড়া, বিশেষ করে পূর্বদিকের দেওয়ালটির মূল অক্ষ সরাসরি উত্তর-দক্ষিণ বরাবর না হয়ে কিছুটা তির্যকভাবে উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম বরাবর হওয়ায় ওই গিরিখাত বরিশালের সমুদ্র উপকূলের প্রায় সমান্তরালভাবে অবস্থান করছে। আষাঢ়-শ্রাবণের প্রবল বর্ষায় যখন গঙ্গা পদ্মা-মেঘনার বিপুল জলস্রোত লক্ষ লক্ষ টন পলিমাটি বয়ে এনে ঢালতে থাকে থাকে মহীসোপানে, তখন তা ক্রমশ স্তূপীকৃত হয়ে জমতে থাকে গিরিখাতের খোলা মুখের আশেপাশে। এক সময়ে সেই বিপুল পরিমাণ পলিমাটি নিজের ওজনের কারণে, বা চন্দ্র-সূর্যের টানে, বা সমুদ্রস্রোতের দিক পরিবর্তনের কারণে, কিংবা পৃথিবীর আহ্নিক গতির ঘূর্ণনের টানে ভারসাম্য হারিয়ে হুড়মুড় করে ধসে পড়ে ওই অতিকায় গিরিখাতের খাড়া দেয়াল বেয়ে। দৃশ্যটা অনেকটা হিমালয়ের তুষারধসের মতো। খালি তফাৎ হ'ল, এই ভূমিধসটি ঘটে সমুদ্রগর্ভে লোকচক্ষুর আড়ালে। এই মহাপ্রলয়ের ফলে সৃষ্টি হয় শক্তিশালী শব্দের তরঙ্গ, যার সঙ্গে চরিত্রগতভাবে ভূমিকম্প জনিত শব্দতরঙ্গের সাদৃশ্য আছে। এই মহাশক্তিশালী তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে কয়েক হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে। সুদূর চট্টগ্রাম, ভোলা, টেকনাফেও এটি অনুভূত হয় এক অতিপ্রাকৃত মহানাদ হিসেবে। কিন্তু যেহেতু এটি প্রকৃত ভূমিকম্প নয়, অর্থাৎ এতে মহাদেশ বা মহাসাগরের ভিত্তিভূমি টেকটনিক প্লেটের সংঘর্ষ বা স্থানচুক্তির মতন ঘটনা ঘটে না, তাই 'বরিশাল গান' শুধু কম্পনেই সীমাবদ্ধ থাকে। সৌভাগ্যবশত এতে সুনামি কিংবা ভূমিকম্প জনিত

ক্ষয়ক্ষতি ঘটানোর মতো শক্তি নিহিত থাকে না। তবে এ ব্যাখ্যাও প্রমাণিত নয়, একটি জোরালো সম্ভাবনা মাত্র।

সোনারপুর আরোহী ক্লাবের দুঃসাহসী বন্ধুরা যাবেন নাকি একবার - মালঞ্চ, রায়মঙ্গলের মোহাঁনা ছাড়িয়ে বাংলাদেশি সুন্দরবনের দুবলা-চরের দক্ষিনে সেই অতলস্পর্শী এলাকায়? বাংলাদেশে 'সাইকেল অভিযান' তো হয়েছে, এবার একটা 'নৌ-অভিযান' হয়ে যাক? কী বলেন? বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ দপ্তর কিন্তু এই অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক অভিযানের অনুমতি এবং ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করেন। এই প্রসঙ্গে দুটো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানিয়ে রাখি --

১) কিছুদিন আগে ব্যক্তিগতভাবে জলঙ্গি পদ্মা যমুনার পরিবর্তনশীল গতিপথ নিয়ে গবেষণা করার সূত্র জানতে পারি যে, শুধু বঙ্গোপসাগরের অতলস্পর্শী গহ্বর নয়, একেবারে হিমালয় থেকে সরাসরি ৯০ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমা বরাবর নিম্ন গাঙ্গেয় অববাহিকায় একটা খোলা বইয়ের মতন টেকটনিক প্লেটের অবনমন ঘটছে বিগত ক'শতক ধরে। এর ফলে ৯০ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমার পশ্চিম দিকের নদীগুলো পূর্ব দিকে আর পূর্বদিকের নদীগুলো পশ্চিম দিকে হেলে পড়েছে। সেই কারণে ধুপগুড়ির পর বাংলাদেশে প্রবেশ করে ব্রম্মপুত্রের পুরনো পূর্বমুখী খাত শুকিয়ে গিয়ে সমস্ত জল সোজাসুজি দাকোগা-যমুনার খাত ধরে নেমে এসে গোয়ালন্দে পদ্মায় মিশে যাচ্ছে। সেই একই কারণে পশ্চিমবঙ্গে পদ্মা থেকে ভাগীরথীর প্রবাহ ক্রমশ পূর্ব দিকে সরে সরে যাচ্ছে ওই ৯০ ডিগ্রির খাঁজের খাত এর দিকে। ঠিক যেন পুরনো নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমিটাই খাড়াভাবে ওই ভাঁজ এর মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

২) ১৭৩৮ বর্গকিলোমিটার এলাকা নিয়ে ছড়িয়ে থাকা ঐ অতলস্পর্শ গিরিখাত এক চির-অন্ধকার পাতালরাজ্য, কিন্তু নিষ্প্রাণ মৃত্যুপুরী নয়। এখানে ডলফিন হাঙ্গর কচ্ছপ ছাড়াও পৃথিবীর অন্তত পাঁচটি বিরলতম প্রজাতির তিমির নিরাপদ প্রজনন ক্ষেত্র। প্রতিটি বছর একটা নির্দিষ্ট সময়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা এইসব প্রাণীর দল ওই পাতালপুরীতে ফিরে আসে মানুষের নাগালের বাইরে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নিরাপদে জন্ম দিতে, তাদের বড় করে তুলতে। এছাড়া আরও কত ধরনের প্রাণী বৈচিত্র্য যে লুকিয়ে আছে ওই অতলে তা বিজ্ঞানের অজানা।

২০১৪ সালের ২৭ অক্টোবর বাংলাদেশ সরকার ওই অঞ্চলটিকে সংরক্ষিত সামুদ্রিক অঞ্চল ঘোষণা করে। সেখানে কোনো রকম বাণিজ্যিক মৎস্য শিকার কিংবা সামুদ্রিক প্রাণীদের শিকার নিষিদ্ধ করেছেন। কেবলমাত্র পরিবেশ ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কাজে ওই অঞ্চলটিতে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া যাবে।

মানুষের সীমাহীন লোভ হিংসা পরিবেশ বিধ্বংসী উন্নয়ন যখন তার তথাকথিত সভ্যতাকে রসাতলে (ভারতীয় পুরাণমতে পৃথিবীর নিচে পাতালপুরীতে আছে সাতটি তল - অতল বিতল তলাতল পাতাল আর সর্বশেষ 'রসাতল') নিয়ে যাচ্ছে, তখন তার একদিকে, এক অন্য 'রসাতলে' জননী বসুন্ধরা সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছেন এক অপূর্ব 'ঈশ্বরের বাগান', তার প্রাণীবৈচিত্র্য আর পাতালপুরীর বজ্রগম্ভীর মহাসংগীত - যার নাম 'বরিশাল গান'!